মঙ্গার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত

ড. আবুল বারকাত

দুর্ঘটনা-পরবর্তী হৈ চৈ– এখন নিয়ম

উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা নিয়ে দেশে এখন বেসামাল অবস্থা। কিছু দুশ্চিন্তা, অনেক হৈ চৈ– বিভিন্ন জন বিভিন্ন কারণে করছেন। দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরে হৈ চৈ– এ দেশে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এখন থেকে নয় মাস আগে উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে এসে যখন বললাম "পৌষ-মাঘে এ ধরণের সংকট আগে খুব একটা দেখিনি; দেশে চলছে নীরব দুর্ভিক্ষাবস্থা; নীরব এ দুর্ভিক্ষ সরব হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র– সম্ভাবনাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি; খুবই খারাপ হবে যদি এটা দীর্ঘস্থায়ী হয়" (সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ, ২৮ মাঘ ১৪০৯); সেই সাথে বিষয়টি যখন বিবিসি-র সাক্ষাতকারে বললাম– তেমন সাড়া মিললো না। ক্ষমতার বাইরে থাকা বিরোধী দল অবশ্য সংগত কারণেই স্বর-উচ্চ করলেন। প্রগতি বাহকরা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-গোলটেবিল করলেন (যেটা তারা প্রায়ই করেন)। সুশীল সমাজ তথৈবচ। কিন্তু যাদের আদেশ-নির্দেশে দেশ চলছে–সেই আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক একদমই নিশ্চুপ; দম নিচ্ছেন (উল্লেখ্য এ দেশের জন্য তাদের প্রণীত দারিদ্র হ্রাস কৌশল পত্রে মঙ্গা বিষয়টি অনুপস্থিত)।

দুর্বৃত্ত তোষণ ও দারিদ্র লালন– উভয়ই যখন নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে তখন স্বাভাবিক যে আর যেই হোক বিষয়টি নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার কোনো গুরুত্ব দেবেন না। তবে আশা করেছিলাম যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার স্বার্থে কোনোভাবে জোড়াতালি দিয়ে হলেও সামাল দেবার চেষ্টা করবে। ব্যর্থ হয়েছেন। এমন কি লজ্জাঙ্কর তথাকথিত লংগরখানাসহ কাজের বিনিময়ে খাদ্য চুরি কার্যক্রম চালু রাখতেও ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষমতার উপর তলায় ডাকাতি হলে নীচে অন্তত চুরি হবে– এটাই স্বাভাবিক।

মঙ্গার পরিণাম নয় কারণ নির্ণয় জরুরি

মঙ্গার পরিণাম নিয়ে বড্ড বেশি কথা হচ্ছে। এমনকি মঙ্গার পরিণাম সংক্রান্ত বিশ্লেষণও অসম্পূর্ণ। মঙ্গার মধ্যে জন্মগ্রহণকারী শিশুটির মস্তিষ্ক-কোষে যে কোনোদিনই আর পরিপূর্ণ বিকাশ হবে না; মঙ্গাক্লিষ্ট মানুষ যে রোগ শোকের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে জীবনীশক্তি হারাবেন; মঙ্গা-এলাকায় শিশু রোগ-মৃত্যুর হার যে দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশি হবে; মঙ্গাক্লিষ্ট মানুষের জীবনের আয়ুস্কাল যে কমবে– এ সবের দায়-দায়িত্ব ক্ষমতাসীনরা কিভাবে এড়াবেন? ঐতিহাসিকভাবেই তো পরবর্তী প্রজন্ম এসব আবিষ্কার করবেন।

মঙ্গার আসল কারণ নিয়ে তো কোনো কথাই হচ্ছে না। ক্ষমতাসীনরা মঙ্গার কারণকে সাধারণ ম্যানেজমেন্ট (ব্যবস্থাপনা) সমস্যা হিসেবেই চালিয়ে দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে– আমন ধান উঠলে, কাজ বাড়লে, একটু মজুরী বাড়লে, মজুরের সংখ্যা বাড়লে, প্রবৃদ্ধি বাড়লে, লঙ্গরখানার সংখ্যা বাড়লে, চাল-গম চুরি কমলে মঙ্গা থাকবে না। প্রথাসিদ্ধ অর্থনীতি শাস্ত্রের বিজ্ঞ বিশারদরা ক্ষমতাসীন দুর্বৃত্তদের সাথে সুর মিলিয়ে সাধারণত: এসবই বলেন (এটা নতুন কিছু নয়)। বলছেন মজুরের সংখ্যা বেশি তাই মজুরী কম, আর মজুরী কম অথচ চাল-আটা-পেঁয়াজের দাম বেশি বলে গরীব মজুর একটু অসুবিধায় আছেন– সামনে সুদিন আসছে; জীবনে তো সবারই একটু আধটু দুর্দিন থাকে। আসলে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কৃষিতে কর্মসংস্থান বাড়লে মজুরী তো আরো কমে যাবে (আমি কিন্তু ব্যাপক অর্থে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পক্ষে)। কেউ তো বলছেন না যে দেশের গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত গত তিন দশকে তিন লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ লুটপাট করেছেন; হরিলুট

চলছে, চলবে। আসলে গরীব মানুষ-মজুরও যে একজন মানুষ সেটা প্রথাসিদ্ধ অর্থনীতি আর দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি– উভয়ই ভুলে বসে আছেন। যা বলা হচ্ছে সবই আসলে যাকে বলে চোখ-ওয়াশ। নেহায়েত ভণ্ডামী। এসব ভণ্ডামীকে অনেকেই এখন আর ভণ্ডামী বলে মনে করেন না; গা সওয়া হয়ে গেছে; সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন। যাকে বলে নিয়তি।

মঙ্গাক্লিষ্ট মানুষের বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত

এ দেশে ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে নীরব দুর্ভিক্ষাবস্থা নূতন কিছু নয়। যাদের বারো মাসই অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় যাপন করতে হয় তারা তো মঙ্গার মধ্যেই জন্ম নেন– মঙ্গা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। মঙ্গাটা তাদের জন্য আর কিছুই না– স্বাভাবিক ক্ষুধার একটু মাত্রাবৃদ্ধি মাত্র। চৌদ্দ কোটি মানুষের বাংলাদেশে সরকারি হিসেবেই মঙ্গা ৬-৭ কোটি মানুষের নিরন্তর নিত্যসহচর। উত্তরাঞ্চলের আজকের মঙ্গাক্লিষ্ট হাড্ডিসার শিশু-নারী-পুরুষ মানুষটি কি দু'মাস আগে হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন? অবশ্যই নয়। পার্থক্য হল হাড্ডিসার মানুষটির হাড্ডিতে এখন চামড়া একটু কমেছে মাত্র। দেখতে মানুষ সদৃশ নয়। ক্ষমতায় যারা থাকেন তারা যখন দরিদ্র-মানুষটিকে মানুষই মনে না করেন (সম্ভবত: গরু-ছাগল ঠাওড়ান) তখনই তো মানব-কল্যাণ সংশ্লিষ্ট ভাবনার উৎসটাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তখনই চোখের সামনে খাদ্য থাকবে, উৎপাদন হবে আগের চেয়ে বেশি কিন্তু দরিদ্র মানুষটি অভুক্ত, ক্ষুধার্ত, বিপন্ন, নিরন্ন হবেন– এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অথচ ক্ষমতাসীনরা যে সংবিধান বলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেখানে বলা হচ্ছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)(২)। সংবিধানের এ-মূলনীতি বিশ্লেষণে আমি মনে করি সাংবিধানিকভাবে মানুষের প্রতি সরকারের যে দায়বদ্ধতা তা পালনে ব্যর্থতাই মঙ্গার উৎস। নিরন্তর দারিদ্র ও মঙ্গাক্লিষ্ট ব্যাপক জনগোষ্ঠি এমতাবস্থায় যদি বলেন ক্ষমতাসীনরা প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন চরমভাবে লঙ্ঘন করছেন, সংবিধানে বর্ণিত জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন– তা হলে কি বেশি বলা হবে? আর শুধুমাত্র এ যুক্তির কারণেই যদি মঙ্গাক্লিষ্ট মানুষ মঙ্গার কারণ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সেটাই তো হবে মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সংবিধান সমুন্নত রাখার সর্বোৎকৃষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত পন্থা।

মঙ্গা নির্মূলে প্রয়োজন জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

আসলেই মঙ্গার মূল কারণ যা তা নির্মূল করা দাতা-নির্দেশিত-আদেশিত প্রচলিত রাজনীতি দিয়ে আর সম্ভব নয়। উৎপাদন ঘাটতি মঙ্গার কোনো কারণই নয়। সরকারি হিসেবেই তো দেখছি বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ২২৬৩ কিলোক্যালরি অথচ দরিদ্র হতে হলে ২১২২ কিলোক্যালরির কম ভোগ করতে হবে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩)। সরকারি হিসেবেই তো এ বছর উদ্বৃত্ত চালের পরিমাণ ৩৫ লাখ টন: উৎপাদন হয়েছে ২ কোটি ৫৩ লাখ টন, আর এ দেশের ১৪ কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজন ২ কোটি ১৮ লাখ টন (এর পরেও বিদেশ থেকে চাল আনার ভেল্কিবাজী চলছে)। আমার হিসেবে ৫% ধনী পরিবার দেশের মোট পারিবারিক আয়ের কমপক্ষে ৫০% দখল করে আছে। সরকারি হিসেবেই তো দেখি গত বছর ব্যাংকে মোট আমানতের (যাকে বলে ব্যাংক ডিপোজিট) পরিমাণ ছিল ৯৩,০৮৪ কোটি টাকা (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩); আমার হিসেবে ঐ আমানতের ২৫%-৩০% দেন গ্রামের মানুষ, অথচ ব্যাংক

ঋণের ৮০% - ৯০% হাতড়ে নেন ঐ ৫% ধনী। নিরন্তর দরিদ্র ও মঙ্গার উৎস তো জনকল্যাণবিমূখ দুষ্ট রাজনীতি-চালিত অর্থনীতিতেই খুঁজতে হবে।

প্রচলিত রাজনৈতিক-অর্থনীতি দেশে কিছু মানুষকে অঢেল সম্পদের মালিকে রূপান্তরিত করছে আর ব্যাপক নিঃস্ব জনগোষ্ঠিকে প্রথমে করেছে নিঃস্বতর, আর এখন ভিক্ষুক। ক্রমবর্ধমান এ অসাম্যের মধ্যেই খুঁজতে হবে মঙ্গার উৎস। উৎসটি মনুষ্য সৃষ্ট। যে অমানুষ অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজকে দুর্বৃত্তায়িত করেছে; সুযোগ পেলে আরো করবে। এমত অবস্থায় মঙ্গা-ক্লিষ্ট মানুষ মঙ্গার চিরস্থায়ী উচ্ছেদের লক্ষ্যে বিদ্রোহ করলে সেটা হবে সংবিধানসম্মত, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার-এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, সম্পূর্ণভাবে নীতি ও সৌন্দর্যবোধসম্মত।

দেশে যে এক কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাভূমি আছে যা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ীই দরিদ্রদের প্রাপ্য সেটা দিয়েও তো মঙ্গার অন্যতম কারণ দূর হতে পারে (কৃষি সংস্কারের অংশ)– সরকারি পরিসংখ্যানই তো বলছে গ্রামাঞ্চলে কৃষি জমির মালিকানা যার যত কম সে ততবেশি দরিদ্র (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩); সংবিধান মেনে নিয়ে প্রাকৃতিক (গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানিসহ) ও অন্যান্য সম্পদে (শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ) দরিদ্র জনগোষ্ঠির ন্যায্য হিস্যা মিটিয়ে দিলেও তো মনুষ্য সৃষ্ট মঙ্গা আর থাকে না; শিল্প কল-কারখানা বন্ধ নয় ব্যাপক উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড প্রসারণের মাধ্যমেও তো মঙ্গাবস্থা প্রশমিত হতে পারে; সেইসাথে সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবিবেচিত ও সর্বত্তোম প্রয়োগও মানব উন্নয়নে তথা দ্রুত ভিত্তিতে মঙ্গা প্রশমনে কল্যাণকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং সম্পূর্ণ বিষয়টিই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক। ভবিষ্যতে মঙ্গা দেখতে না চাইলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রের সরকার দরিদ্র মানুষকে গরু-ছাগল হিসেবে নয় মানুষ হিসেবেই ভাববেন। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে যারা বিভাজিত করেছেন, বঞ্চিত করেছেন, বিপন্ন করেছেন তারা সাময়িকভাবে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর হলেও শেষ পর্যন্ত আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে– এটা সোজা ইতিহাস। আর সব সময়ই এ ইতিহাস রচনা করেছেন মানুষ। এ বিষয়ে দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, বিপন্ন মানুষ কিন্তু এক সময় হয়ে ওঠেন জোটবদ্ধ ও আপোসহীন– এটাও ইতিহাস। আমি তো অন্তত আমাদের দেশের সবদিক বিবেচনায় এ ধরণের ইতিহাস সৃষ্টির আলামত দেখছি।

অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অসাম্য যে বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদিত হচ্ছে তাতে মনে হয় এ দেশের দরিদ্র-মঙ্গাক্লিষ্ট ব্যাপক জনগোষ্ঠি একটা ওলট-পালট করলো বলে। যেমনটি বলেছিলাম কয়েকমাস আগে যে দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে– সরব হওয়া সময়ের প্রশ্ন মাত্র।